সাংবাদিক দীপেন্দ্রনাথ

পবিত্র কুমার সরকার

বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ওগবেষিকা সনজীদা খাতুনের কথা দিয়ে শু করি। সনজীদা লিখেছেন,'উনিশশোচুয়ান্ন সালে তাকে প্রথম দেখি। এদেশের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়েরপর ঢাকাতে সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। একটি সুন্দর সম্মিলন উৎসব।সাংবাদিক হিসেবেই বুঝি এসেছিলেন তিনি। ফিরে গিয়ে 'নতুনসাহিত্যে' যে রিপোর্ট লিখেছিলেন-তা পড়ে হেসেছিলাম আমরা। ঢাকাররিক্সাওয়ালাও জীবনানন্দের কবিতা আওড়ায়- এ ধরণের কথায় হাসব নাই বা কেন!'(সম্ভবত নিশ্চয়ই - পরিচয় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা।১৯৭৯ফেব্রুয়ারি-মার্চ।)

তখন দীপেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র একুশ। সবে মাত্র আই-এ পাশকরেছেন, বাংলা অনার্স নিয়ে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছেন। ঐ বয়সেইতাঁর কলমের জোর বুঝে নিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিকরা।পূর্ববঙ্গ সফর সেরে ফিরে এসে দীপেন্দ্রনাথ পরিচয়ে তাঁর লেখা শু করেন। সেই থেকে পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হন এবং আমৃত্যু এই সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে নিজেকেজড়িয়ে রেখেছিলেন। ঐ সফর কালে কৃষক অভ্যুত্থানের কিম্বদন্তী নেত্রী ইলামিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এক অপার বিস্ময়ের গ্রন্থিমোচনকরেছিল। ইলা মিত্রকে নিয়ে 'সূর্যমুখী' রিপোর্ট াজ তাঁরপরিচয়ের প্রথম রচনা(জৈষ্ঠ ১৩৬১)। পরে
ঐ নেত্রীকে নিয়ে'ফুল ফোটার গল্প' নামে একটি গল্পও লেখেন। তবে'সূর্যমুখী' আর 'ফুল ফোটার গল্প'- এর মধ্যে পার্থক্যখুব সামান্যই- সূর্যমুখীর মধ্যে সংবাদ সাহিত্যের যে বীজ নিহিত ছিল তা ফুলফোটার গল্পের রসদ। অবশ্য সূর্যমুখীকে একটা জীবনের গল্প বলাই ভাল।এখানে দীপেন্দ্রনাথ এক বিপ্লবী জীবনের কথক হয়ে উঠেছেন। পরবর্তী কালেওদীপেন্দ্রনাথ সাংবাদিক হিসেবে এই ভূমিকাটাই পালন করে গেছেন। জানা অজানা বহুলড়াকু মানুষের লেখচিত্র এঁকেছেন দক্ষ শিল্পীর হাতে।

রিপোর্টাজ সম্পর্কে একটা কথা হয়- শুটায় একটু দ্বন্দ্বজন্দ্বদ্বন্দ্ব বাহেঁয়ালি থাকবে যা থেকে পাঠকদের সংবাদ পাঠে আগ্রহ জাগে। লক্ষ কন'সূর্যমুখী'র শুটা- ''ভয় ছিল ভেঙে পড়ব। ভয় ছিল হয়তো মুখ তুলে তাকাতে পারবো না। যেন বর্তমান শতাব্দীর অপরাধ বোধ চেপেবসেছে আমার কাঁধে। উত্তর দাবী করছে , চাইছে জবাব।

চিনতাম না। তবু , এতগুলি বিছানার মধ্যেও একদৃষ্টিপাতে তাকে খুঁজে নিলাম।সাদা শাড়ী, সাদা জামার মধ্যে একখানি শ্বেত-মূর্তি। পায়ের দিকে. খাটের গায়ে ঝোলানো জ্বরের চার্ট।ওদিকে একটা মিটসেফ্। এপরে বই কখানা ছড়ানো।''

এই অংশটা পড়ার পর যে কোনও পাঠকের আগ্রহ নাজেগে পারে না। তার পরের প্যারাতেই সেই আগ্রহ মেটালেন তিনি- সুভাষদাআলাপ করিয়ে দিলেন। ইলা মিত্র.....।

একেবারে গল্পের ঢঙে লেখা এই সংবাদ-বিবরণ। শব্দচয়ন ওডিটেলের কাজও লক্ষনীয়। 'সূর্যমুখী'র লেখক কিন্তু এরপরপ্রধানত গল্প রচনায় মন দেন ননী ভৌমিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরঅনুপ্রেরণায়- দেবেশ রায়ের কথায় এটা আমরা জানতে পারি। ১৯৫৬-৬২দীপেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যে সম্পদ দিয়ে গেছেন তা আবহমান কাল বেঁচে থাকবে। এইসময়ের ভেতর আমরা পাই তাঁর 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাস এবং'ঘাম', 'নরকের প্রহরী', 'জটায়ু','অশ্বমেধের ঘোড়া', 'স্বয়

স্বর সভা', 'ফুলফোটারগল্প', 'পরিপ্রেক্ষিত '- এই সব অবিস্মরণীয়গল্প।

এরপর রাজনৈতিক জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যাদীপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে ধস নামাল। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ , ভারতেকমিউনিস্ট আন্দোলন ভাঙ্গনের বিষাদ পরিবেশ তাঁর মনে ও মননে গভীর ছাপফেলে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর সৃজনশীলতার মধ্যগগনের দীপ্তিক্ষণিক ঢাকা পড়ে যায়।

সে এক দুরন্ত সময়। বিশ্বের দেশে দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার একের পর এক দেশে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল চূর্ণহচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় তখন মানুষের মনেরাজনৈতিক পালা বদলের গভীর আগ্রহ দেখা দিয়েছে। সেই সময় ভবানী সেনের সম্পাদনায় সুন্দরী মোহন এভিনিউ থেকে সি পি অ াইয়ের দৈনিক মুখপত্র 'কালান্তর' প্রকাশিত হল।

কালান্তরের গোড়ায় দীপেন্দ্রনাথ যোগ দিতে পারেননি। ১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ঐতিহাসিক পালাবদল সূচিত হল।দীর্ঘ বিশ বছর পর কংগ্রেস শাসনের পতন ঘটল। জণজাগরণের পথ বেয়ে ক্ষমতায়এল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন ভারতের ন-টি র াজ্যে প্রতিবেশীবিহার সহ অকংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। দীপেন্দ্রনাথ কালান্তরের কর্মীহিসাবে যোগ দিলেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৯ সালপর্যন্ত আমৃত্যু তিনি এই পত্রিকার কর্মী ছিলেন। তিনি পত্রিকার রবিব ারের পাতার সম্পাদকছিলেন। এই বারোটা বছর অনেক কাছথেকে আমার দীপেন্দ্রনাথকে দেখার সুযে াগ হয়েছিল । তাঁর পাশে বসে কাজ করার, তাঁর কাছে লেখা শেখার পরমসৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। তাঁর শাসন, স্নেহ ও ভালোবাসর স্পর্শ পেয়েছি। অনেক রাত কালান্তর পত্রিকা দপ্তরেতাঁর সঙ্গে কা টিয়েছি। তার মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না। নিজের মত ও অবস্থানের ব্যাপারে তিনিছিলেন দ্বিধাহীন ও নির্ভীক। কিন্তু সে জন্য ব্যক্তি সম্পর্কের ওপর তার কোনও রেখাপাত ঘটত না। সৃজনশীল প্রতিভার ম ানুষ ছিলেনদীপেন্দ্রনাথ। স্বভাবতই কিছুটা অভিমানী ছিলেন, কিন্তু বারেকের জন্য স্পর্শকাতর ছিলেন না। যতটা সম্ভবসকলের ভাল করার চেষ্টা করতেন। ছোট খাটো চেহারার মানুষ ছিলেনতিনি, শারীরিক বাধ াও ছিল। কিন্তু কার্যদক্ষতা ও প্রতিভা গুণে তিনি পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছিলেন। দীপেন্দ্রনাথছিলেন কমিটেড রাজনৈতিক কর্মী-- মনে প্রাণে কমিউনিস্ট, শ্রেণীহীনসমাজ গড়ার কারিগর। তিনি পার্টির কোনও স্তরের নেতা না হয়েও পার্টির বিবেক হয়ে উঠেছিলেন। আর লেখক সংস্কৃতি কর্মীদের সহজাতঅভিভাবক ছিলেন তিনি। তাঁকে যতদেখেছি, তত বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছি।

দীপেন্দ্রনাথ শারদীয় কালান্তরের সম্পাদনার দায়িত্বপালন করেছেন বাংলা ১৩৭৫ থেকে ১৩৮৫ সাল অর্থাৎ এগারো বছর একটানা। ঠিক একই সময়ে তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠবাংলা সাহিত্য পত্রিকা পরিচয়েরও সম্পাদক ছিলেন। এরমধ্যে ১৯৬৮ থেকে ৭৬ পর্যন্ত তণ সান্যালের সঙ্গে যৌথভাবে,১৯৭৬ থেকে এককভাবে ঐ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। চরিত্রের দিক থেকে শারদীয়কালান্তরের কিছুটা ভিন্নতা ছিল, একটি রাজনৈতিক দলের কাগজহওয়ার কারণে। কিন্তু সেই পত্রিকারপাতায় বাংল া সাহিত্যের প্রগতির ধারাটিকে তিনি সূচাগ্র করতেসক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হয়েউঠেছিলেন স্বকালের প্রতি দায়বদ্ধ এক সম্পাদক। সবচেয়ে বড় কথা, কালান্তর ওপরিচয়ে যাঁরা লিখতেন তারা ভুলেও কে ানদিন একটা পয়সাও চাইতেন না। আজকের বাংলা সাহিত্যের অনেকপ্রথিতযশ সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে দীপেন্দ্রনাথের হাতে। বহু অলংকরণ শিল্পীকেও তিনি আবিষ্কারকরেছিলেন। দীপেন্দ্রনাথের সম্পা দিতপ্রথম শারদীয় কালান্তর ১৩৭৫-এর সংখ্যার মাত্র তিনটি লেখা উল্লেখকরলেই বোঝা যাবে তিনি কে ান্ মাপের মানুষদের লেখায় রেখায় এই পত্রিকাভরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যজিৎরায়ের ১৫টি স্কেচ্ সহ গুণীর গানের নোটেশান, মৃণাল সেনের লেখা'ছবির জগতে ঝড়' ঋত্বিককুমার ঘটকের সাম্প্রতিক ন াটকের একটিসমস্যা' পর পর ছাপা হয়েছে। ঐপত্রিকার প্রথম লেখাটি বিষ্ণু দের কবিতা। দীপেন্দ্রনাথ ক ারোর কাছে লেখা চাইলে তিনিতা দিতেনই-- অন্যথা হওয়ার যো ছিল না।

আগেই বলেছি দীপেন্দ্রনাথ ১৯৬৭-তে কালান্তরে যোগদেন। তখন দৈনিকের পাশাপাশি সাপ্তাহিককালান্তর বের হত। সে সময়সাপ্তাহিক কালান্তর সম্পাদনা করতেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। দীপেন্দ্রনাথ ঐ কাগজে বিনয় বাবুর সঙ্গে জুড়েগেলেন। নিজে দু'হাতে লিখতেনআবার একাই অন্তত তিন বছর যে াল পাতা কাগজের প্রুফও দেখতেন।প্রুফ দেখতেন বলে তার মনে কোনদিন প্রশ্ন জাগে নি- পার্টিরকাজের ছোট বড় তিনি বাছাই করতেন না। সাংবাদিক হিসেবে দীপেন্দ্রনাথের পূর্ণ বিকাশ কালান্তরেই। তাঁর সাড়া জাগানো প্রায় সবকটি সংবাদ ও রিপোর্টাজ দৈনিক ও সাপ্তাহিক কালান্তরে প্রকাশিতহয়েছিল। অবশ্য পরিচয়ে সংবাদধর্মীরচনা দিয়ে তার শু হয়েছিল। পরিচয়ে সংবাদধর্মী রচনা দিয়েই তিনি যাত্রা শেষ করেন। শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকেরপালা'র পাঠকে কী অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তিনি তার 'পাড়ি'রচনায়(শারদীয় পরিচয় ১৯৭৮) ধরে রেখে গেছেন। এটি সাংস্কৃতিক সংবাদ রচনায় একটিদিকচিহ্ হয়ে থাকবে।

দীপেন্দ্রনাথ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ দৈনিক ও সাপ্তাহিককালান্তরে নানান ধরনের সংবাদধর্মী রচনা লিখেছেন। অনেকের একটা ধারনাআছে দীপেন্দ্রনাথ খুবই কম লিখেছেন। উপন্যাস ও গল্পের ব্যাপারে কথাটা সত্যহলেও সংবাদ, রিপোর্টাজ ও সাক্ষাৎকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নয়। বরং তিনি এত রকমের লিখেছেন যা স্বল্পপরিসরে বলে শেষ করা যায় না। এমনকি জনমত বিভাগেও লিখতেন, তবে সেখানে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা দাস,তপন উপাধ্যায়, সিরাজ ইসলাম নামে। দৈনিকের একাধিক সম্পাদকীয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য(প্রসঙ্গক্রমে শিরোনামে) লিখেছেন নানান সময়ে। ১৯৬৯-এর ১৬ নভেম্বর ব্রিগেড প্যারেডময়দানে সি পি আই একটা খুবই বড় সমাবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাতে উদ্দীপিত দীপেন্দ্রনাথ ১৭ নভেম্বরেরকাগজে '১৬ নভেম্বর ওরা এসেছিল' নামে একটি রিপোর্টাজ লেখেন। এই লেখায় অবশ্য তার নাম ছিল না। তখন কালান্তরের পলিসি অনুসারে নামেকোন রিপোর্ট বা রিপোর্টাজ সচরাচর প্রকাশিত হত না। একটা জনসভার বিবরণ কেমনভঙ্গি ও ভাষায় প্রকাশ করা যায় তা লক্ষ কন--

''আশ্চর্য দৃশ্য। তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার খাদ্য জুটল কি জুটল না--সমস্ত বাংলাদেশ পদ্মাসনে বসেছে। এক কোণে মুসলমান কৃষকরা আলাদাসামিয়ানার তলায় হাঁটু গেড়ে বসে নামাজ পড়ছে। ঈদের নামাজ পড়েই কৃষকরা নিঃশব্দে মিলে যাচ্ছে সভার শ্রোতে।

আর হো চি মিনের প্রকাণ্ড প্রতিকৃতিরওপর পশ্চিম আকাশের লাল আলো। আরশোনা গেল--

সামনে দিন- জোর লড়াই
জোট বাধো তৈরি হও।

তারপর মাইকে ঘোষিত হল সেই অমোঘ মন্ত্র- বিভেদ নয়,ঐক্য চাই।''

ছোট্ট একটা ক্যানভাস কত বড় হয়ে উঠেছে।রাজনীতি-সমাজইতিহাস-আন্তর্জাতিকতা-সংগ্রাম সব মিলে মিশে একাকার।

দীপেন্দ্রনাথ ১৯৬৮ সালে বিহারে ভারতের কমিউনিস্টপার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গিয়েছিলেন। সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'কার্যানন্দনগর'। সেখানে তিনি বিহারের কৃষক আন্দোলনেরকিম্বদন্তী নেতা লক্ষত্র মালাকারের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। ফিরে এসে সাপ্তাহিক কালান্তরের৯-৩-১৯৬৮ সংখ্যা থেকে ছয় পর্বে লেখেন তাঁর সাড়াজাগানো কাহিনী'ঘোড়েওয়ালা বাবু'। তাঁর ঐলেখা এবং সাংবাদিক নিরঞ্জন সেনের নফর কুণ্ডু ছদ্মনামের আড়ালে রসরচনাপত্রিকার বিত্রি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এবারদীপেন্দ্রনাথের মুখে ঘোড়েওয়ালা বাবুর কথা শুনুন--

''আশ্চর্য এই নাম। কারোর কাছে এই নামই কমিউনিস্টপার্টি। আবার কারোর কাছে এই নামের অর্থ ভিন্ন।এই নাম আজীবন নক্ষত্র মালাকারের পিছু নিয়েছে। কিন্তু তিনি জানেন, আমরাও জানি- জীবনে পরীক্ষার অন্তনেই। আর নামের অগ্নিশুদ্ধিও শেষ হবার নয়।

হয়তো বোঝেনতিনি ঃ নক্ষত্র মালাকার থেকেও মালাকারের নামকে অতিক্রম করতে পারা। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর নামহীনজীবনস্রোতে পরিপূর্ণ ভাবে মিশে যাওয়াই তাঁর জীবনের শেষ পরীক্ষা। তাই গল্পের মধ্যে অত্যন্ত সচেতন ভাবে, কিছুটাঅভিমানের সঙ্গে- হয়তো বা পরিবেশ বাপরিস্থিতির অনিবার্য প্রভাবেই- বারবার নিজের নাম উচচারণকরলেও; নক্ষত্রের মধ্যে যেন এক তীর্থযাত্রাকে আবিষ্কার করি-- শেষপর্যন্ত যার লক্ষ্য ইতিহাস। যে জানে মানুষকে প্রতি মুহূর্তে তার আত্মপরিচয় আবিষ্কারকরে প্রতিষ্ঠা করে চলতে হয়, অথচ যে বোঝে এ পথের পথিকমাত্রেই বিশেষ হয়েও নির্বিশেষ, এবং যে স্বীকার করে তার অর্থই হলো একধরনের অজানা জীবন।

গোটারিপোর্টাজের পরতে পরতে এমন সব ব্যঞ্জনা রয়েছে যা সমগ্র রচনাটিকেউৎকৃষ্ট সংবাদ সাহিত্যের গোত্রে উত্তীর্ণ করেছে। এই রচনা মহাকাব্যিক বীরগাথায় পরিণতহয়েছে ।

১৯৬৮ সালের অক্টোবরে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতেপ্রবল বন্যা হয়েছিল। তিস্তারকরাল গ্রাসে বহু মানুষ, জীবন, ঘরবাড়ি চলে গিয়েছিল। বন্যার মাস তিনেক পরে বানভাসি মানুষদেরমাঝে গিয়ে সামান্য মানুষদের অসামান্য কাহিনী তুলে আনলেন। সাপ্তাহিককালান্তর ১৮ জানুয়ারী ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর আরেকটিচমকপ্রদ রিপোর্টাজ 'আমি ইণ্ডিয়া'। দীপেন্দ্রনাথের এই রিপোর্টাজকে কি বলা যাবে— ছবি, গল্প না সংবাদরচনা। মাঝে মাঝে আমার মতো অনেকেই ধন্ধে পড়ে যান । এই রিপোর্টাজে যে সংলাপ তিনি পেশকরেছেন, মাত্র কয়েকটি সিড়ি পেরোলেই তা একটা উপন্যাস বা গল্প হতেপারত। তাঁর শেষ উপন্যাস'বিবাহ বার্ষিকী' (শারদীয় কালান্তর ১৯৭৭) পড়লেওদেখা যাবে তাতে রিপোর্টিং আছে। 'চর্যাপদের হরিণী'র মতো তাঁর একাধিক গল্পেওরিপোর্টিং আছে। একই ধরন; সিড়ি ভেঙে তিনি কখনও সংবাদ রচনায়,কখনও গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্ণেস্ট হেমিংওয়ে "Theold man and the Sea" উপন্যাসে এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন ।

মোটকথা একটি বিশেষ রচনা শৈলীতৈরী করেছিলেন। ছোট ছোট সহজবাক্য। অথচ কি গভীর ব্যঞ্জনাময়। সমাজের, দেশ-কালের সমস্যাগুলো অবলীলাক্রমে উঠে আসত তাঁরকলমে। বিভিন্ন মানুষের চরিত্র চিত্রণ ওকথোপকনের মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিকতা এনেছেন খুবই দক্ষতার সঙ্গে। 'আমিইন্ডিয়া'য় রাজবংশী চাষী রমণীর আটপৌরে কথায় বুঝে নিতে অসুবিধাহয় নি, তিস্তায় বাঁধ দেওয়া কেন জরিছিল। এতদিন পর পশ্চিমবঙ্গে তিস্তাকে বাঁধ দিয়ে বশ মানানো হচ্ছে।

শেষ করার আগে আরেকটি কথা বলতে চাই। রবিবারের কালান্তর, পরিচয় ছাড়াওদীপেন্দ্রনাথ অনেকগুলি স্মারকপত্র সম্পাদনা করেন যেগুলির ঐতিহাসিকমূল্য কোন অংশে কম নয়। ১৯৫৮-য় ছাত্রফেডারেশনের মুখপত্র 'ছাত্র অভিযান' সম্পাদনা করেন। সম্পাদনা করেন কলকাতা ঝিবিদ্যালয় ছাত্রসংসদের বার্ষিকী (ডিসেম্বর ১৯৫৮)। সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রতিভারস্ফুরণ ছাত্র অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ করা যায়। 'একতা'য় সত্যজিৎরায়ের 'পথের পাঁচালী'র পূর্ণ সংলাপটি প্রকাশিতহয়েছিল। অতএব যে-কোন পত্রিকারই যেঐতিহাসিক গুত্ব আছে রচনা পরিকল্পনা ও নির্বাচনে সে কথাটা তিনি সর্বদাই মাথায়রাখতেন। ভারতের কমিউনিষ্টপার্টির পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'কমিউনিস্ট' নামেএকটি স্মারকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারেরসম্পাদনায়, সহযোগী সম্পাদক ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। আসলে গোটা স্মারকপত্রের প্রকৃত রূপকার ছিলেনতিনিই। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলন চর্চা করতে হলে এইস্মারকপত্রটি এড়িয়ে চলা যাবে না, এমনই তথ্য সমৃদ্ধ এটি। তাঁর সম্পাদিতআর একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন — লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত বাংলা কবিতাসংকলন 'লেনিন শতাব্দী'। এইসংকলনে সম্পাদকের ছোট্ট একটি ভূমিকায় শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে দীপেন্দ্রনাথেরঝিাস ও ভাবনার আভাস পাওয়া যায়।

সোভিয়েত-ভারত সংস্কৃতি সমিতির আমন্ত্রণে ১৯৭১-এর শেষে দীপেন্দ্রনাথ অন্যান্যদের সঙ্গে লেনিনের সেই দেশ সোভিয়েত ভ্রমণে যান। ফিরে এসে পাঁচ পুরনো বলশেভিক—কামনেস্কি, ফিয়োদোরভ ইয়ান জাকোভলেভিচ,কুজনিতসোভ গ্রেগরিআলেকসান্দ্রেভিচ, ভলকোভ কিনানদ্র কিরিলোভিচ। চের্নিৎসা ইভানকর্নিভিচকে নিয়ে 'লেনিনের দশহাত' নামে আরেকটি অসাধারণরিপোর্টাজ লেখেন, যা তিন কিস্তিতে (১,১৫,২৯ জানুয়ারী)সাপ্তাহিক কালান্তরে ছাপা হয়। ভ্রমণকাহিনী কত জীবন্ত ও সারগর্ভ হতে পারে এইরচনা তারই নিদর্শন। যেখানে আবেগ উষ্ণতার ভেতর দিয়ে দীপেন্দ্রনাথ একলহমায় নিজেকে আন্তর্জাতিকতার মোহনায় মিলিয়ে দিয়েছেন—

''কমরেড কামিনস্কির হাত আমার দুই হাতেধরে বললাম ঃ ভারতবর্ষের একজন নাগরিক আমি তোমার ঐ দুটি হাত ধরতেপারাকে পরম সৌভাগ্য মনে করি। কারণ ঐ দুটি হাত দিয়েই তুমি শীত-প্রাসাদের দরজা খুলেদিয়েছিলে। সেই সঙ্গে খুলে দিয়েছিলেনতুন পৃথিবী ও নতুন সভ্যতার দুয়ার।

কমরেডকামিনস্কি বলে উঠলেন ঃ আরে না, আমি না লেনিন — লেনিনই যা কিছুকরেছেন ।

আমি বললাম ঃ নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমরাই তো ছিলে লেনিনের হাত ।

কামিনস্কি খুশি হয়ে বললেন ঃ তা অবশ্যি বলতেপারো।''

দীপেন্দ্রনাথ লেখার ব্যাপারে সম্পাদনার ব্যাপারে শব্দ চয়নবাক্য বিন্যাস ও বানানের ব্যাপারে বড় খুঁতখুঁতে ছিলেন ।. জীবন আচরণের শুদ্ধমানসিকতার ছাপ রচনা ও সম্পাদনায় ছিল ।পরিচ্ছন্নতার অনুসারি যেমন ছিলেন,তেমনি ছিলেন সবধরনের গোঁড়ামিরও বিরোধী । পত্রিকা সম্পাদনার সময় রাতের পর রাত জাগতেন-একেবারেনির্ভুল কাগজ যাতে বেরোয় সে জন্য নিজে হাতে শেষ প্রুফটা দেখতেনপ্রতিটি লেখার ।

এস এস কে এম এ চেক্আপ করতে ১৯৭৮-এর ডিসেম্বরে ভর্তি হয়েছিলেন । সবাই ভেবেছিল চিকিৎসা করিয়ে পূর্ণ উদ্যমে দীপেন্দ্রনাথ দশ হাতে কাজ করবেন।হঠাৎই ১০ জানুয়ারি ১৯৭৯ অবস্থার অবনতি ঘটল । ভাবাই যায়নি হাসপাতালে গিয়ে এমন গুতরঅসুস্থ হয়ে পড়বেন ।তাই হল । রাত জেগে দেবেশ রায়অমিতাভ দাশগুপ্ত সহ পরিচয়ের বনধু ও সহযোগিরা তদারকি করতেন ।১৪ জানুয়ারি কালান্তরে কয়েকজনকর্মীর রাত জাগার কথা ছিল । ঐ রাতে আমারই পালা ছিল । দীপেন্দ্রনাথ সে সুযোগই দিলেন না আমাকে। ঐ দিনই তিনি চিরবিদায় নিলেন মাএ৪৫ বছর বয়সে । দুর্ভাগ্য আমাদেরদুর্ভাগ্য সারা বাংলার ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com